Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 177-183

পরিবেশ ভাবনা ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ : একটি বিশ্লেষণ

চিরঞ্জিত মান্ডি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

বৈদিক যুগে ঋষি উচ্চারণ করেছিলেন পরিবেশের আদিমতম মন্ত্র—

“ওঁ মধু মাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধবীণঃ সন্তোষধীঃ মধু নক্ত
মুতোষসি মধুমৎ পার্থিব রজঃ। মধু দৌরত্ত নঃ পিতা।।[১]

সৎকর্মপরায়ণ মানবের প্রতি বায়ু মধুর হয়, নদী মধুময় রস ক্ষরণ করে। আমাদের কাছে ঔষধিসমূহ মধুমত হোক। রাত্রি ও দিন মধুময় হোক। পৃথিবী বা ভূলোক এবং পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের কাছে মধুময় হোক।

আমরা অনুধাবন করতে পারি পৃথিবীর আদিযুগ থেকেই পরিবেশ মানুষের আলোচনার বিষয়। সংস্কৃত ঋকবেদ- সংহিতা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে পরিবেশ প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি রচনায় লেখকদের ভাবনায় পরিবেশ প্রকৃতির অপূর্ব রূপ পরিলক্ষিত হয়। আধুনিকযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যের শাখায় পরিবেশ ভাবনা আরও গভীরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের লেখায় পরিবেশ তার নিজস্বতা পেয়েছে। ঐ সময়কাল থেকে বলা যায় ধীরে ধীরে সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আলোচনা করা যাক। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিখুঁত প্রকৃতির রূপকার হিসেবে অধিক পরিচিত। প্রকৃতি তার সাহিত্য সৃষ্টিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে তার রচনায়। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফুল- ফল, লতা- পাতা ও প্রতিদিনকার দেখা পথে প্রান্তরের বৃক্ষাদি স্থাপিত হয়েছে মানুষের মতন করে। পৃথিবী দেখে মুগ্ধ হওয়াকে যদি দার্শনিকতা বলা হয় তবে বিভূতিভূষণকে দার্শনিক বলতেই হবে। বসবাসের ভূমি থেকে আমরা যতটুকু গ্রহণ করি ঠিক ততটুকু সেই ভূমিকে ফিরিয়ে দিতে পারলে তবেই দায়বদ্ধতার পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতি নির্ভর রচনাগুলিতে সেই কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। বাংলা অঞ্চল থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত দেখা না দেখা, পরিচিত – অপরিচিত সবুজ পৃথিবীর পরিচয় মেলে বিভূতির সাহিত্যে। অনেক সমালোচকই একসময় বিভূতিভূষণকে পলায়নবাদী প্রকৃতির কথক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), ‘অপরাজিত’ (১৯৩১), ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯), ‘ইছামতী’ (১৯৫০) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি পড়লে তা সহজেই সাধারণ পাঠকসমাজ অনুমেয় করতে পারে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এক রোমান্টিক কল্পনা জগত নির্মাণ করেছেন।

শুধু উপন্যাস সাহিত্যে নয়, সাহিত্যের অন্যান্য অংশেও তিনি সচেতনভাবে সবুজ পৃথিবী, পরিবেশবাদী ভাবনা ও বিপন্ন পৃথিবীর সংকট তুলে ধরেছেন। ‘অভিযাত্রিক’ (১৯৪১), ‘তৃণাঙ্কুর’ (১৯৪৩), ‘ঊর্মিমুখর’ (১৯৪৪), ‘ও হে অরণ্য কথা কও’ (১৯৪৮) নামক দিনলিপি ও স্মৃতিকথায় বিভূতিভূষণ পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ, বন, অরণ্যানী ও প্রাণীকুলের জন্য অভয়ারণ্য সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই বিভূতির সাহিত্যে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বাঙ্ময় সত্তা। মানুষের মতো প্রাণসত্তায় কথা বলে ওঠে বিভূতির প্রকৃতি।

আমাদের প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’(১৯৩৯) উপন্যাসে পরিবেশ ভাবনা। আরণ্যক উপন্যাসের পরিবেশ ভাবনা আলোচনা করতে গেলে প্রচলিত সাহিত্য চিন্তার বাইরে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, শিল্পীর শুভবোধ ও আধুনিক মানুষের আগ্রাসী মনোবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

আমরা জানি, পরিবেশ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। একজন আবহাওয়াবিদের কাছে যা বায়ুমণ্ডল, একজন পরিবেশবিদের কাছে স্থলমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল উভয়কে চিহ্নিত করে। পরিবেশকে আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর করে তোলাই তার লক্ষ্য। সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে বোঝায়—‘আমাদের চারপাশে যা তাই পরিবেশ।’ যা সপ্রাণ প্রাণীজগৎ ও নিষ্প্রাণ বস্তুজগতের সমন্বয়ে গর্বিত। এই জগতের পাশাপাশি মাটি ও জল বা জড় উপাদানগুলি এর সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শিশু-কিশোর বয়স থেকেই বিভূতিভূষণ পরিবেশ সচেতন ছিলেন। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে সেই পরিবেশ ভাবনার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন।

বর্তমান পৃথিবীর আগ্রাসী মানবসভ্যতা যেভাবে সবুজ বনভূমি ধ্বংস করছে এবং বসতবাড়ি নির্মাণ করছে বিভূতিভূষণের কাছে পাপেরই নামান্তর মনে হয়েছে। ‘আরণ্যক’- এর প্রস্তাবনায় সত্যচরণের মুখ দিয়ে বইহারের জঙ্গল উচ্ছেদকে পাপ বলে স্বীকার করেছেন। সত্যচরণের কাছে অরণ্যস্মৃতির সুখের নয়, বরং দুঃখের, কারণ সত্যচরণকে ত্রিশ হাজার বিঘা জঙ্গল ধ্বংস করে চাষযোগ্য জমি তৈরি করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম শহর ও মানুষের স্পর্শহীন বন

প্রান্তরের মধ্যকার পরিবেশগত পার্থক্য বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক'- এর প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ করেছেন—

> ''নিকটেই একটা বাদাম-গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউখেলানো জমিটা দেখিয়া হটাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তরসীমানায় সরস্বতী কুন্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্নের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।[২]

--কৃত্রিম শহর বন্যপ্রান্তরের সরস্বতী কুন্ডী ক্ষণিক শান্তি দিতে পারেনি সত্যচরণকে। ইঁট-কাঠের শহরে মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম ফোয়ারা, পরিখার পাশে যান্ত্রিক জীবন সত্যচরণের কাছে নিবিড় রহস্যময় হয়ে উঠতে পারেনি।

অত্যধিক তাপদাহে বনে আগুন লেগে পরিবেশ বিপর্যয়ের চিত্রও এঁকেছেন দক্ষতার সঙ্গে। বর্তমানে দুনিয়ার মানুষ ব্যক্তিগত সুখ ও অধিক সঞ্চয়ের জন্য যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে, পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে এই বিষয় ভাবনাও বিভূতিভূষণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর ধারণা মানুষ যখন ব্যক্তিগত চিন্তা বিসর্জন দিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে সম্পদ কুক্ষিগত করার চিন্তা ত্যাগ করবে তখনই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

'আরণ্যক' উপন্যাসে সেই গভীর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। মুনেশ্বর সিং- এর প্রত্যাশা অধিক কিছু নয়। মাত্র একখানা লোহার কড়াই। রান্নাবান্না ও ভাত খাওয়ার সুবিধার জন্য তার একমাত্র চাওয়া, এর বেশি সে আশা করে না। অপর এক চরিত্র রাজু পাঁড়ে। লেখক যাকে সত্যিকারের সাত্ত্বিক মানুষ বলেছেন। দুই বিঘা জমি সত্যচরণ রাজুকে দিয়েছিল চাষবাসের জন্য, কিন্তু সে এক বছরেরও চাষযোগ্য জমি গড়ে তুলতে পারেনি। মূলত রাজু বিষয় সম্পত্তিতে আকর্ষণ অনুভব করে না। জীবনের উন্নতি বলতে যা বোঝায় রাজু পাঁড়ে তাতে আমল দেয়নি। বনজঙ্গল তার কাছে শ্রদ্ধাস্বরূপ দেবতা রূপে পরিগণিত হয়েছে। রাজু পাঁড়ের মুখে পরিবেশসচেতন ভাবনার ছবিটা আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে—

''জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর! জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভালো জায়গা, ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখি ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকে না...'' ।[৩]

এখানে বিভূতিভূষণ সচেতনভাবে ওঁর শব্দটিতে ঁ(চন্দ্রবিন্দু) বসিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বন-বৃক্ষ-লতা ও বনের পশু-পাখিকে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সন্মানের আসনে বসালেন। লেখকের মতে পরিবেশের প্রতি সমর্পণই পারে আজকের বিপন্ন পৃথিবীকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

উপন্যাসে 'ডামাবাণু' ও 'টাঁড়বারো' দুটি ভিন্নধর্মী ধর্মাবিশ্বাসের উল্লেখ পায়। এই ধরণের ধর্মবিশ্বাস

যা আদিকাল থেকে জঙ্গলের পরিবেশকে রক্ষা করে আসছে। বোমাইবুরুর জঙ্গলে যারা বসবাস করতে আসে সকলেই রাতের বেলা কখনো সাদা কুকুর অথবা কখনো পরী দেখতে পায়। সত্যচরণ এই গোপন সত্যটি চেপে রেখে রামচন্দ্র আমীন ও তার পেয়াদা আসরফি টিন্ডেলকে বোমাইবুরুতে চাষবাসের জন্য জমি দেয়। রাতে সাদা কুকুর দেখে রামচন্দ্র আমীন, আসরফি টিন্ডেল দেখে যুবতী নারী। পাগল হয়ে যায় রামচন্দ্র আমীন। আরও পরে এক বৃদ্ধ তার ছেলেকে নিয়ে বোমাইবুরুতে বসবাস করার সময় এই ধরণের ঘটনা ঘটতে শুরু করে। বৃদ্ধের ছেলের ঘর থেকে সুন্দরী নারী আসে প্রতি রাতে। বৃদ্ধ দেখতে পেলেও তার ছেলে দেখতে পায় না। অঘোরে মরে যায় বৃদ্ধের ছেলে। আসরফির ভাষায় বিভূতিভূষণ বলেন—

"ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরুর পাহাড়ের ওপরেই ওই বটগাছটা দেখেছেন দূরে একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে এদেশে এদের বলে 'ডামাবাণু' – এক ধরনের জীনপরী, নির্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে মেরে ফেলে।[৪]

'ডামাবাণু'র এই বিশ্বাস অরণ্য সম্পর্কে এক ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। পৃথিবীর বহুস্থানেই এই ধরণের লোকবিশ্বাসের ওপর ভর করেই অচিরেই জঙ্গলের পরিবেশ রক্ষা পাচ্ছে।

অপরদিকে বিভূতিভূষণ 'টাঁড়বারো'র কথা বললেন যা পরিবেশ রক্ষার্থে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। প্রাণীকুলের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থেকেছে শিকারীদের এই লোকবিশ্বাসের দরুণ। শিকারী শিকারের নিকটবর্তী হলে মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো' বুনো মহিষের দলের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়। 'আরণ্যক'- এ গনোরী তেওয়ারীর মুখে লেখক বর্ণনা করেছে সেই আশ্চর্য কাহিনী—
"হটাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক পালালো, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এলোনা একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন নিজের চোখে দেখা।[৫]

পরিবেশের মধ্যে অন্যতম দুটি উপাদান হল ফুল ও পাখি। সমগ্র 'আরণ্যক'- এ তা বেশ বড়ো জায়গা দখল করে আছে। লবটুলিয়ার কৃত্রিম হ্রদ সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে বাস করা পাখির একটি তালিকা বিভূতিভূষণ উপস্থাপন করেছেন যা পাঠককে অবাক করে। যেমন—শ্যামা, শালিক, হরটিট, বনটিয়া, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল, চিল, কুল্লো, বক, খিল্লি, রাঙাহাঁস, মানিক পাখি, ডাকসহ জলচর ও স্থলচর পাখির বর্ণনা করেছেন। যার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় লেখকের ভাষায়—
"অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না। আমি শুইয়া আছি দেখেতেছি, আমার চারপাশে হাত

দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায়-লতায় বসিয়া কিচকিচ করিতেছে আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও নেই। পাখিদের এই অসংকোচ সঞ্চারণ আমার বড়ো ভালো লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পলায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।[৬] মানুষে-পাখিতে এই পারস্পরিক ভয়লেশহীন অসংকোচ সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতা পরিবেশ সচেতন মননের ফসল বলা যায়।

পরিচিত ও অপরিচিত বহু ফুল- লতার সমাহার উঠে এসেছে উপন্যাসে যুগলপ্রসাদ ও সত্যচরণের মধ্য দিয়ে। এই তালিকা বেশ দীর্ঘ- ভিঁয়েরা লতা, বনজুঁই, শিউলি, ময়না কাঁটা, ভুঁই কুমড়ো, হংসলতা, হোয়াইট বিম, রেড ক্যাম্পিয়ন, স্টিচওয়াট, ফক্সগ্রুভ, জগরোজ, ওয়াটার ক্রোফট, দুধিয়া প্রভৃতি। ফুল-লতাদির উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের পরিবেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'আরণ্যক'- এর দুই চরিত্র যুগলপ্রসাদ ও সত্যচরণের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের স্বচ্ছ পরিবেশ ভাবনার-ই পরিচয় পাওয়া যায়।

'আরণ্যক'- এ পরিবেশ সচেতন ভাবনার একটি উজ্জ্বলতম নিদর্শন হল বিভূতিভূষণ এখানে নির্মম পশুশিকারের কাহিনী বর্ণনা করেননি। যেটুকু আছে তা বিভূতিভূষণের পশুপ্রেমী মনের সাক্ষাৎ মেলে—

''রাজু পাঁড়ে সহ অন্যান্যরা রাতের অন্ধকারে শূকর শিকারে গেলে তা ভণ্ডুল হয়ে যায় নীল গাই দেখার মধ্য দিয়ে'[৭]

শিকারি সভ্যতার হিংস্রতা লেখক সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন। সুরতিয়াদের পাখি ধরার প্রসঙ্গটিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। সুরতিয়ারা দুটি পোষা শিক্ষিত গুড়গুড়ি পাখির সাহায্যে দুটি নতুন পাখি ধরেছে। গুড়গুড়ি দু-পয়সা আর ডাহুক সাত-পয়সায় রতনগঞ্জের হাটে বিক্রি করেছে। সত্যচরণ সেই গুড়গুড়ি পাখি কিনে এনেছেন। কিন্তু উপন্যাসে বিভূতিভূষণ পাখির পরবর্তী দশা বর্ণনা না করলেও এটা স্পষ্ট হয় যে সত্যচরণ পাখিগুলিকে শূন্য আকাশে মুক্ত করে দিয়েছেন।

উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছদে এসে আমরা লবটুলিয়ার জঙ্গলকে বস্তিরূপে আবিষ্কার করি। জঙ্গল কেটে সেখানে মানুষের বসবাসের স্থান গড়ে উঠেছে। প্রকৃতি, বৃক্ষাদি, জলাশয়, খোলা প্রান্তর না থাকলে তবে তা প্রাণহীন হয়ে ওঠে। লবটুলিয়ার তেমন এক বস্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যচরণের শঙ্কা নিষ্ঠুর ভাবে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। সব নির্মমতার মধ্যেও সত্যচরণ যেমন সরস্বতী কুণ্ডী বাঁচিয়ে রেখেছিল, তেমনি যুগলপ্রসাদও প্রকৃতিকে নিঃস্বার্থভাবে কিছু দিতে চেয়েছে—

''যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ হইতে শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলি বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন না কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়া ছিল একদিন

একথা নাইবা কেহ বলিল।[৭] উল্লেখ্য বিভূতিভূষণের এই ভাবনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের স্বচ্ছ পরিবেশ পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে।

উপন্যাসের শেষ অংশে গিয়ে দেখা যায় অনাগত বিপন্ন ভবিষ্যত ও নিভৃত অরণ্যের জন্য হাহাকার। বিভূতিভূষণ দেখালেন সত্যচরণ সেই মানুষের প্রতিনিধি যারা মনে করে, প্রকৃতিকে জয় করে, প্রকৃতিকে কর্ষণ করেই পৃথিবীর সভ্যতা এগিয়ে যাবে। ফলতঃ এসব সভ্যতাদর্পী মানুষের হাতে পরিবেশের বিনষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তিনি মনে করতেন জনমানবহীন অরণ্যে মানুষের বিচরণ মানেই অরণ্যভূমির অবধারিত সর্বনাশ। যান্ত্রিক পৃথিবীর পরিবেশের সংকটের কথা ভেবে যেন উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন লেখক—

‘‘এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে যখন মানুষ অরণ্য দেখিতে পাইবে না। শুধু চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের নির্মাণ চোখে পড়বে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোক তীর্থে আসে। সেইসব অনাগত মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।[৮]

বনধ্বংসের করুণ ইতিহাসকে বহন করেছে আরণ্যক। আধুনিক প্রগতির এক মর্মান্তিক বিষাদ গাথা হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষ অংশে বনধ্বংসের করুণ চিত্রটি ধরা পড়ে সত্যচরণের বিদায় মুহূর্তে—

‘‘বিদায় বেলায় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আসরফি টিন্ডেল সকলেই পালকি ঘিরে থাকে। মটুকনাথ সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে। কেঁদে আকুল হয় কুন্তা। সুরতিয়া ও ছনিয়া বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যচরণ চলে যাচ্ছে। নাঢ়া বইহারের জঙ্গল ততদিনে মানুষের কলহাস্যে পরিপূর্ণ। চারিদিকে ফসলের ক্ষেত, গবাদি পশুতে ভরে গেছে ঘরবাড়ি। ঘনবনে আজ মানুষের সমারোহ। বস্তিতে ভরে উঠেছে এক সময়কার সবুজবন।[৯]

শেষপর্যন্ত বনহত্যার মধ্য দিয়ে সত্যচরণের ট্র্যাজিক পরিণতি উপন্যাসকে বেদনাবিধুর করে তুলেছে। সত্যচরণ দূর থেকে মহালিখারূপ ও মোহনপুরা বনের উদ্দেশ্যে নমস্কার করেছে। অরণ্যের সবুজ বৃক্ষাদিকে আদিম দেবতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। সত্যচরণের এই ভাবনা মূলত পরিবেশ বিনষ্টের পাপবোধ থেকেই উৎসারিত। সত্যচরণ বাধ্য হয়েছে বন ধ্বংস করতে অথচ সত্যচরণ বনভূমিকে রক্ষা করতেই চেয়েছিল।

আধুনিক সময়কালে আমরা ভবিষ্যতের পরিবেশের কথা চিন্তা না করেই অচিরেই বনভূমি ধ্বংস করে চলেছি। বৃক্ষকাটার পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ বিষয়টি আমরা ভুলে গেছি। প্রাকৃতভাবে গড়ে ওঠা বনজঙ্গলের পাশাপাশি বসতবাড়ির সঙ্গে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র জঙ্গলও আমরা নিমেষে ধ্বংস করে চলেছি অবলীলাক্রমে। আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সেই দায়িত্ববোধের কথা, সেই বৃক্ষবন্দনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। শুভেন্দু গুপ্ত, *প্রাচীন পরিবেশ চিন্তা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ১২

২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি রচনাবলী (৫ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ০৩

৩। তদেব, পৃ. ৪১

৪। তদেব, পৃ. ৪৬

৫। তদেব, পৃ. ৬৪,

৬। তদেব, পৃ. ৭৬

৭। তদেব, পৃ. ৭৮

৮। তদেব পৃ. ১৪৯

৯। তদেব পৃ. ১৪৯

১০। রুশতী সেন (সম্পা), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪

১১। কবিতা নন্দী চক্রবর্তী, *বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা,* আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৭